Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-II, January2022, Page No.27-33
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার অবহেলিত জনজীবনের অনালোচিত লোকগান হরাণ

ড. অনিরুদ্ধ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, বাগাটি, মগরা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:

'Haran' is a type of Bengali folk song sung by rural folks collectively in the winter season. It is commonly sung by people hailing from the lower strata of the caste-ridden Hindu society. Needless to say, these people have been made victims of economic exploitation and caste discrimination through generations. 'Haran' gives expression to their life and experience. Its association with the socially marginalised people in addition to the fact that it has never been a part of the mainstream culture of Bengali song hindered its widespread promotion and dissemination. It pertained among the rural people living at the margins of Hindu society, mainly namasudras, in such districts as Faridpur, Khulna and Gopalgunj among others of erstwhile East Bengal. The song made its passage to the other side of Bengal with the post-partition exodus of these people. A majority of them came to settle in the Nadia district of West Bengal. Though its tradition is still kept alive by them in those regions of the state of West Bengal they scattered across and settled in, its popularity has significantly dwindled nowadays. The villagers of those places form small groups and beg alms from door to door singing the 'Haran' song daylong during the last week of the month of Poush in the Bengali calendar. On the occasion of the Poush Parban (a day of ritual celebration in Bengal) these villagers assemble in the evening for an open-air ritual feast that remains open for participation to each and everybody beside a road or alongside a meadow and sing 'Haran' songs in unison to observe the day. Mainly a source of entertainment, the culture of 'Haran' thus plays a key role in maintaining social cohesion and preserving traditional values in the village life as well. In this context this paper is intended to familiarise the readers with the 'Haran'

as a folk performance and its role in the social life of a rural Bengali community.

Keywords: *Haran, folk song, marginalised Hindu, namasudras, song sung in unison, Poush ritual, Sonaraya*

পৃথিবীর আদি সংগীত হ'ল লোকসংগীত। কেন না জীবনের প্রয়োজনে আপনাআপনি সৃষ্টি হয়েছে এ গান। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কায়িক সংগ্রামের ভিতর দিয়েই আদিম মানব সমাজে সংগীতের উৎপত্তি। এ কথার মধ্যে যে বিশেষ অতিরঞ্জন আছে, এমনটি বলা যাবে না। কিন্তু যে উত্তাপ নিয়ে খুব আহ্লাদ করে এ কথাগুলো উচ্চারণ করে এক শ্রেণীর বোদ্ধা শ্লাঘা বোধ করেন, ততটা সংগীত তথা লোকসংগীত প্রিয় তারা মোটেও নন। সামগ্রিক অর্থে এই 'লোক' বা 'ফোক' (Folk)-এর চর্চা করতে গেলে যে ধরণের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন তা লোকসাহিত্যের অনেক বড় বড় সেবকেরও নেই। আমার আলোচ্য বিষয় সমগ্র 'ফোকলোর' (Folklore) বা 'লোকসংস্কৃতি' নয়, বিশেষ এক ধরণের লোকগান, যার নাম 'হরাণ'।

হরাণ গান কি?

অনগ্রসর বঞ্চিত হিন্দুদের একটা অংশ বিশেষত নম:শূদ্ররা পৌষ মাসের শেষ এক সপ্তাহ ধরে নিজেরা গানের দল তৈরি করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পৌরাণিক ততসহ অন্যান্য বিষয়কেন্দ্রিক গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করেন এবং পৌষসংক্রান্তির দিন সেই আহরিত চাল-ডাল (মাঙ্গন বা মাগন বা মাগুন) দিয়ে বনভোজন করেন। এই বিশেষ ধরণের গানই হল হরাণ।

হরাণ গানের বৈশিষ্ট্য :

ক) হরাণ গান মূলত পৌষ মাসের শেষ এক সপ্তাহ ধরে গাওয়া হয়।

খ) সমাজের নিম্নবর্গ ও নিম্নবৃত্তির মানুষ সারাদিন নিজেদের মূল জীবিকাগত কর্ম নির্বাহ করে সন্ধ্যাবেলা দলবদ্ধভাবে গ্রামে বেরিয়ে পড়েন গান গাওয়ার জন্য।

গ) যাঁরা মূলত এই গান গেয়ে থাকেন তাঁদের কোন প্রথাগত সাংগীতিক শিক্ষা থাকে না। তাঁরা স্বশিক্ষিত শিল্পী।

ঘ) প্রথমে একজন এই গান শুরু করেন পরে বাকিরা ধরেন যাকে দোয়ারকি বলে।

ঙ) পুরাণের কাহিনী নিয়ে মূলত হরাণ গানগুলো বাঁধা। এর নির্দিষ্ট কোন পদকর্তা নেই, নেই কোন লেখ্যরূপ। কাজেই একই গানের নানান ব্যবহারিক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে সমসাময়িক রেখাপাতকারী ঘটনা নিয়েও এই গান বাঁধা হয়। যেমন – বন্যা, খরা, দেশভাগ প্রভৃতি। আবার হাল্কা চালের বিষয় নিয়ে এ গান বাঁধা হয়। শিবকে নিয়ে এমন অনেক গান হয়েছে।

চ) কোন কোন দল খালি গলাতেই গেয়ে থাকেন। আবার যাঁরা একটু অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম তাঁরা নারা রকম রঙিন পোষাকের বন্দোবস্ত করেন এবং গ্রামেরই কিশোরীদের রাধা, কৃষ্ণ, বলরাম, সখী ইত্যাদি সাজিয়ে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচার জন্য প্রস্তুত করেন। তাঁদের গানের সঙ্গে থাকে হারমোনিয়াম, বাংলা ঢোল, খোল, করতাল, বাঁশি, সারিন্দা, দোতারা ইত্যাদি।

ছ) গৃহস্থের বাড়িতে সংঘবদ্ধ গানের দল নিয়ে প্রবেশ করার আগে গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে দলেরই কোন একজন সদস্য বলে ওঠেন 'বর বর বস্তের বর' বাকিরা উচ্চারণ করেন 'ধান চাইল-এ (চাল) গুলা

(গোলা) ভর।' এই বর বর বস্তের বর'-এর অর্থ হ'ল, বাস্তুদেবতার কাছে উক্ত গৃহস্থের জন্য বর চাওয়া হচ্ছে। আর 'ধান চাইল-এ (চাল) গুলা (গোলা) ভর'-এর অর্থ হ'ল যে, তাঁর বাড়ির গোলা যেন ধান- চালে ভরে ওঠে।

জ) গানের শেষে সোনারায়ের নামে 'মাগুন' (মাঙ্গন বা মাগন) চাওয়া হয়। এই সোনারায় হ'লো আঞ্চলিক লোকদেবতা। তাঁর প্রতীক কলাগাছ।

ঝ) পৌষসংক্রান্তির দিন সোনারায়ের বিয়ে দেওয়া হয় গান গেয়ে গেয়ে। বনভোজন স্থলে একটি কলাগাছ পুঁতে, ফুল-মালায় সাজিয়ে তার চারিদিকে দলের সবাই এমন কি পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেকে ঘুরে ঘুরে বিশেষ এই গানটি গেয়ে থাকেন। এটিকে বলা চলে বিবাহগীতি। গানটির শুরুটা এ রকম – 'হারে রে ছোট্টখাট্টো সোনারায় নল কাটিবার যায়'।

ঞ) এই গানের সঙ্গে মজার চৌর্যবৃত্তির জুড়ে থাকে। গান গাইতে গাইতে গানের দলের কেউ কেউ গৃহস্থ বাড়ির মাচায় ফলে থাকা, ঝুলে থাকা লাউ, পুঁই ডাটা সহ মানকচু ইত্যাদি নিপুণ দক্ষতায় থলিগত করেন। সেগুলো অবশ্যই ঐ বনভোজনের দিন সকলের রসনা তৃপ্তির কাজে লেগে যায়। কাজেই এই চৌর্যবৃত্তিকে ঐ অঞ্চলে কেউ খুব একটা দোষের কাজ বলে মনে করেন না।

হরাণ নামের আড়ালে :

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন এই গানের নাম হরাণ? ক্ষেত্রসমীক্ষা যতটুকু তথ্য উঠে এসেছে তা হ'ল, এই গান গাইতে গেলে একটা গোটা দিনের পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। যাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাজাবেন তাঁদের যন্ত্রগুলো প্রস্তুত করা, যে কিশোরীরা নৃত্যে অংশ নেবে তারা সকাল থেকেই নানা রকম প্রাকৃতিক প্রসাধন সামগ্রী (হাড়ির কালি, বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতার রস, নীল রং ইত্যাদি) জোগাড়যন্ত্রে নেমে পড়ে এবং প্রসাধনের জন্য তাদের দীর্ঘক্ষণ লেগে যায়। এরপর পোশাক জোগাড় করা, যে বস্তা বা থলেতে 'মাগুন' আনা হবে সেটিকে প্রস্তুত করা, যে সেটি বহন করবে তাকে খুঁজে বার করে এই কঠিন দায়িত্বটি আরোপ করা। আরো আনুষঙ্গিক টুকিটাকির বন্দোবস্ত করা। সব মিলিয়ে একটি হয়রানিময় প্রস্তুতি। এ জন্য ঐ অঞ্চলের কেউ কেউ এই গানকে বলতে চান হরাণ গান।[২] বিশিষ্ট লোকসংগীত শিল্পী শ্রী স্বাগত দে'র মতে, এই গানগুলোর বিষয় হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে শিব অর্থাৎ হর-এর কথা এসেছে। আরেক অর্থে তাই শ্রী দে এই গানকে বলতে চান হরগান। আর সেখান থেকেই এসেছে বলেই তাঁর বিশ্বাস। আর একটি অর্থ আমাদের মনে আসে তা হল 'হর' শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ হল 'হরণকর্তা'। অর্থাৎ এই হরগান গাইলে ও শুনলে জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, অনেক বিপদ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায়। হর সব যন্ত্রণা হরণ করে নেন এই বিশ্বাসে এই গান গাওয়া। এই 'হরণ' শব্দ থেকেও হরাণ এসে থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অঞ্চল ভেদে এই হরাণ গানের আরো দু'একটি নাম আছে, তা হ'ল, হালুই (নদিয়ার বেতাই অঞ্চলে এই নামটি প্রচলিত) গান, ভারবোল গান (নদিয়ার কিশোরপুর, গোপালপুর প্রকৃতি অঞ্চলে এই নামের চল আছে) পোষলা, পুষুড়ের গান ইত্যাদি।

হরাণের অতীত :

আগেই বলা হয়েছে যে, এই হরাণ গান একেবারেই অনালোচিত একটি বিষয়। কোন লোকসংস্কৃতি-গবেষক এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন নি আজ পর্যন্ত। বর্তমানে যে সব অঞ্চলে হরাণ গানের চল আছে, অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লোকসংস্কৃতি-গবেষক তথা অধ্যাপকেরা সেই অঞ্চলের অন্যান্য কিছু লোক সংস্কৃতির উপাদানের সন্ধান করেছেন এবং তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধও করেছেন[৩] কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই হরাণ

গানের মতো বিষয় তাঁদের নজর এড়িয়ে গেছে। কাজেই এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কোন গ্রন্থের সাহায্য পাওয়া যাবে না। কিছু আনুমানিক বিশ্লেষণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষাই এ নিবন্ধ রচনার সহায়ক।[৪] খাঁটি পূর্ববঙ্গের লোকসংগীত এই হরাণ। বিশেষত ফরিদপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রান্তিক হিন্দু, মূলত নম:শূদ্র সম্প্রদায়ের অন্যতম সংগীত।[৫] কবে, কিভাবে, এই গানের সূত্রপাত তার কোন প্রামাণ্য নথি আমাদের কাছে নেই। বাংলাদেশ নদীকেন্দ্রিক দেশ। কাজেই জলাকীর্ণ জলভূমি। বন্যার প্রকোপ নেহাত কম ছিল না। নানা রকম রোগ-ব্যাধিও হত। কখনো কখনো তা মহামারীর আকার নিতো। বর্ষা শেষে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জলমগ্ন হয়ে থাকত। অনেক সময় শারদীয়া উৎসব খুব উৎসাহ-সমারোহের সাথে পালন করা যেত না। এদিকে চাষবাস শুরু হয়ে যেত জোরকদমে। শরৎ-হেমন্ত পেরিয়ে যখন শীত আসত তখন প্রায় সবার ঘরে ঘরে নতুন ধান এসে যেত। এবার যখন এই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা যেত তখন দীর্ঘ জলযন্ত্রণা, রোগভোগ, হাড়ভাঙা পরিশ্রম এ সবকে দূরে রেখে মানুষজন খুঁজতো একটু দীর্ঘকালীন আনন্দের অবকাশ। নবান্ন উৎসব হ'ত তবে তার অগ্রহায়ণ মাসে; এক দিনের জন্য। তাতে আশ মিটতো না। কাজেই আরো দীর্ঘকালীন উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হ'তো। আর তারই ফলশ্রুতিতে এল হরাণ গান। এই গান জন্ম নেওয়ার পেছনে আরো একটি দুটি গুরুতর কারণ ছিল বলে মনে করা চলে। বাংলাদেশ যেমন প্রধানত নদীমাতৃক দেশ তেমনি আবার জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বর্ষায় চারিদিক ডুবে গেলে জঙ্গলের পশুদের খাবারে টান পড়তো। জল আস্তে-আস্তে নেমে যেতে থাকলে তারা খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে প্রবেশ করতো। ভরা ফসলের মরশুমে জঙ্গলের অনেক হিংস্র পশু, তৃণভোজী পশুর উপদ্রব শুরু হতো। পশুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঐ অঞ্চলের মানুষেরা সংঘবদ্ধ হয়ে সন্ধ্যার পর প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। এই কাজটি ছিল যথেষ্ট আয়াসসাধ্য এবং বিরক্তিকর। কাজটিকে তুলনামূলকভাবে বৈচিত্র্যময় ও মজাদার করার জন্য কালে কালে এর সাথে গান যুক্ত হ'ল ফলে গোটা ব্যাপারটিই হয়ে উঠল বিনোদনময়। ক্রমশ এটি প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের আনন্দে নিজেকে মেলে ধরল। এল হরাণ গান।

আরও একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে, তা হল শীতের ফসল ঘরে এলে, চোর-ডাকাতের আনাগোনা বাড়ত তাল মিলিয়ে। তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একত্রিত হতে হ'তো। এভাবেই গান সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

এখন হরাণ :

আজকে হরাণের অবস্থার কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, কী ছিল আর কী হলো। একদা বাংলাদেশে জন্মে দেশভাগের পর তা ভারতবর্ষ তথা এ বঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে কম-বেশি হরাণ গানের চল আছে। বিশেষত, নদীয়া জেলার করিমপুর থানার অন্তর্গত নন্দনপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন মহিষখোলা, গড়াইমারী, কানাইখালি, জয়নাবাদ, বাগাডোবা, কিশোরপুর, তেহট্ট থানার অন্তর্গত ছিটকা গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনে মৃগী, বাহাদুরপুর, হরিপুর গ্রাম, এছাড়া নদিয়ার বেতাই, দেবনাথপুর, বগুলা, ময়ূরহাট, মদনপুর প্রভৃতি জায়গায় হরাণ গানের প্রচলন আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মাতীরবর্তী কিছু অঞ্চলেও হরাণের প্রচলন আছে। যেমন, ঠাকুরনগর কলোনী, গোদাগাড়ী উল্লেখযোগ্য। তবে এখন আগের মতো ব্যাপক হারে আর এই গান গাওয়া হয় না। একবিংশ শতকের একেবারে শুরু থেকেই হরাণ গান জনমানসে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। আগে যেমন খুব উৎসাহের সঙ্গে হরাণ গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। একটা উৎসবের আকার ও মেজাজ তৈরী হ'ত পৌষ মাসের শেষ সপ্তাহ

জুড়ে। এখন তা একদমই নেই। এ গানই প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। এর অবশ্য বেশ কিছু কারণ আছে। প্রথমত, আগে বহুমাত্রিক বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই মানুষ নিজেদের মতো করে বিনোদনের ব্যবস্থা করে নিতেন। সেখানে সকলেরই প্রায় উজ্জ্বল ভূমিকা থাকতো। মানুষেরা মানুষকে নিয়ে আন্তরিক আনন্দে মেতে উঠতে পারতেন, চাইতেনও। সামাজিক আনন্দ উপভোগে সক্ষম হতেন। কিন্তু এখন মানুষের এত সময় ও ইচ্ছে কোনটাই নেই এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবর জন্য। এছাড়া এখন বিনোদনের অনেক লোভনীয় ও মনোহরণকারী মাধ্যম হয়ে গেছে, যার থেকে যুব সমাজের মন ফেরানো রীতিমতো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে হরাণ।

দ্বিতীয়ত, সামাজিকতার গুরুত্ব বোঝেন নি বিশ শতকের শুরুর দিকের যুব সমাজ, যাঁরা হরাণের সাথে যুক্ত ছিলেন। হরাণ গানের মাধ্যমে যে সামাজিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আন্তঃসামাজিক বন্ধন এবং অন্তঃপারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হয় এই উপলব্ধি তাঁদের ছিল না। কাজেই নতুনদের তাঁরা উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করতে পারেন নি হরাণ গানকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তৃতীয়ত, ঐতিহ্য সম্বন্ধে অসচেতনতা। যাঁদের বাপ-ঠাকুরদারা এই গান গেয়ে আসছিলেন কাল-কালান্তর ধরে, পরবর্তীতে তাঁরাই আর হরাণ গান গাওয়াতে উৎসাহ বোধ করলেন না। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতাই বর্তমান প্রজন্মকে এ গানে নিরুৎসাহিত করছে। চতুর্থত, চারিদিকে নানান অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও অপসংস্কৃতি যে ভাবে সমাজের মজ্জায় গিয়ে সুস্থ সামাজিক রুচিকে জোর ঝাঁকুনি দিচ্ছে তার নেতিবাচক প্রভাব এই প্রজন্মের ওপর পড়ছে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে লোকসংস্কৃতির চর্চা করবেন তাঁরা এমন ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলত হরাণের মতো অতি প্রয়োজনীয় একটি সামাজিক সংগীত কালের গর্ভে বিলীন হতে বসেছে। পঞ্চমত, হরাণ গান মূলত হিন্দু তপশিলী শ্রেণীভুক্ত নমঃশূদ্রদের গান। এ গান উচ্চবর্ণের কারোর দ্বারা/কাছে স্বীকৃতি পায় নি। আবার নমঃশূদ্রদেরও কেউ হরাণ নিয়ে প্রচারে আগ্রহ দেখান নি।

হরাণের ভবিষ্যৎ :

খুব আশার কথা শোনানো যাবে না হরাণের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ এই মুহূর্তে কোথাওই আর আগের মতো হারাণের চর্চা নেই। কোন কোন অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তির দিন কয়েক জন মিলে চাঁদা দিয়ে বনভোজনের মাধ্যমে সেরে ফেলছেন হরাণ-উদযাপন। হরাণ তো সেখানে ব্রাত্য। হরাণের বদলে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে শ্রুতি-যন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চগ্রামে বাজানো সস্তার বাজারি গান। গত এক দশকের মধ্যেই হরাণ গানের জনপ্রিয়তা দ্রুত শেষ হয়ে গেল যা বড় বেদনার বিষয়। এমন কোনো আশার আলোও দেখা যাচ্ছে না যে ভবিষ্যতে হরাণ গান আবার ফিরে আসবে স্বমহিমায়।

হরাণ গানের সামাজিক গুরুত্ব :

এক, হরাণের মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল এ গান যূথবদ্ধ গান। কাজেই একা এ গান গাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা মিলে দল তৈরি করে হরাণ গেয়ে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক বন্ধন তৈরি হয় এ গানকে কেন্দ্র করে।

দুই, সমাজের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয় হরাণকে সামনে রেখে। এবং সম্পর্কগুলির নির্দিষ্ট নাম থাকে। যেমন, কাকা, দাদা, পিসি, খুড়ো, খুড়ি ইত্যাদি।

তিন, হরাণের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চাকে বিজ্ঞাপিত করা যায় অতি সহজেই।

চার, লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির উপাদান ও তার চর্চাকে উৎসাহিত করে এ গান। নব্যযুবকদের নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেন করে হরাণ।

পাঁচ, দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে এই ধরনের স্বদেশি বিনোদনে মানুষ নিজেদের নিয়োজিত করে আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করেন।

ছয়, একাকিত্ব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করে প্রসারতা, উদারতা দান করে হরাণ।

সাত, এই গানের বিষয় পুরাণনির্ভর। অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রাম্য মানুষের পৌরাণিক রস আস্বাদনের বাসনা কিছুটা হলেও পূরণ হয় এই হরাণ গানের মাধ্যমে।

আট, হরাণ গানের পদকর্তাদের নাম জানা যায় না। অনেক পদকর্তা আবার নাম জানানোর ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। এটাই চল হয়ে গিয়েছিল হরাণের ক্ষেত্রে। হরাণের চর্চার মধ্যে দিয়ে বাংলায় একদল সহজাত উদাস কবির বা পদকর্তার জন্ম হয়, যাঁরা আপন আনন্দে পদ রচনা করে চলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এমনটি প্রায়শই ঘটত।

নয়, হরাণ গানের চর্চার মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মচেতনারও চর্চা চলত গ্রাম বাংলায়।

হরাণের প্রাসঙ্গিকতা :

আজকের এই বিপন্ন সময়ে এই ধরনের সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার যে প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। এখন কেউ কারোর বাড়িতে যায় না, কেউ কারোর খোঁজ-খবর রাখেন না। সবাই সবার থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে যেন এক দূরতর দ্বীপ। পাশাপাশি থেকেও কেউ কাউকে জানেন না। সবার কাছে এখন দামি 'গ্যাজেট'-এর সাথে অনন্ত নিরবচ্ছিন্নতা। অনন্ত সখ্য। এ কোন সময়? কেন এল এ সময়? হরাণদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আস্তে আস্তে এ সময়কে আহ্বান করেছে, তা বোধহয় চিন্তনহীন মানুষও বুঝবেন। কাজেই আজ এবং আজই এই গানের চর্চার বেশি প্রয়োজন।

হরাণকে বাঁচাতে গেলে :

যারা মুখ্যত হরাণ গাইতেন তাঁদের পরিবারের নতুনদেরকে হরাণের বিষয়ে উৎসাহিত হতে হবে। তাঁদেরকে উদ্যোগী হয়ে বাকিদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। যাতে এই গান আবার আগের অবস্থায় ফেরে। নমঃশূদ্রদের মধ্যে যারা শিক্ষায়-সম্মানে-মেধায়-অর্থে-প্রভাবে এগিয়ে গেছেন তাঁদের নিজেদের এই সম্পদের প্রচার করতে হবে জনমানসে। এর সামাজিক গুরুত্ব বোঝাতে হবে সবাইকে। এ বিষয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করেও এর সম্বন্ধে মানুষকে জানানো যেতে পারে।

এই প্রত্যাশা রাখতে ভালোই লাগবে যে হরাণ গান আবার স্বমহিমায় ফিরবে বঙ্গে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে, নতুন রূপে। সকলের আগ্রহের বিষয় হবে আমাদের সাধের হরাণ গান।

তথ্যসূত্র :

১. হরাণ নিয়ে আমিই প্রথম জাতীয় স্তরে আলোকপাত করি। এই গানের বিষয়, তার গুরুত্ব এবং এ সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতার কথা জানিয়ে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি প্রস্তাব পাঠাই 'ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন' (ইউ.জি.সি.) -এর দপ্তর দিল্লিতে 'মাইনর রিসার্স প্রোজেক্ট'-এর আকারে। যাতে এই বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান করা যায় ও গানগুলোকে সংরক্ষণ করা যায়। আমার সে প্রস্তাব দিল্লির কেন্দ্রীয় সংস্থা গ্রহণ করেন এবং এ কাজের ব্যয়ভার তাঁরাই বহন করেন। ইতিমধ্যেই আমি সে কাজ সম্পন্ন করেছি। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে গানগুলো সংগ্রহ করে আমি নিজে এবং বাংলা লোকগানের প্রতিষ্ঠিত সুগায়ক শ্রী স্বাগত দে - দু'জনে গানগুলো 'রেকর্ড' করি। এবং শেষ পর্যন্ত এটি একটি সুখশ্রাব্য হরাণ গানের সংকলন

হয়েছে। এর প্রচার-প্রসারের স্বার্থে এখানে জানিয়ে রাখি যাঁরা এই গানের সংকলনটি সংগ্রহে রাখতে চান তাঁরা সামান্য বিনিময় মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারেন। তার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে এই শ্রুতিসংযোগে – ৯৪৩৩৬৭৮৪৯৫।

২. শ্রী নীলরতন মণ্ডল, নদিয়া জেলার করিমপুর থানার অন্তর্গত নন্দনপুর পঞ্চায়েতের গড়াইমারী গ্রামের একজন হরাণ গায়ক, তিনি বলেন যে, এ গানের প্রস্তুতি খুবই পরিশ্রমসাধ্য এবং হয়রানিবহুল। সেখান থেকেই এ গানের নাম হয়েছে হরাণ।

৩. ভুল ওড়ানো, কুলাইর মাগন, অকূলে সুমতি পূজা, গার্সী সংক্রান্ত, অলক্ষ্মী বিদায়, অষ্টক গান প্রভৃতির বর্ণনা আছে অনেক লোক সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থে। যেমন এ প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে, তা হ'ল 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ'। সম্পাদনা - বরুণকুমার চক্রবর্তী, ডি.লিট.।

৪. হরাণ গান সংক্রান্ত আরো নতুন কোন তথ্য পেলে পাঠকবর্গকে জানাতে অনুরোধ করি এই বৈদ্যুতিক ডাকে – draniruddhabiswas@yahoo.com

৫. শ্রী নীলরতন মণ্ডলের পিতা শ্রী রঞ্জিতকুমার মণ্ডল আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁর বাড়ি ছিল ওপার বাংলার ফরিদপুর। সেখানে তাঁর ছোটবেলায় এই হরাণ গান খুব ধুমধাম করে হ'ত। শুধু ফরিদপুর নয়, পাশাপাশি খুলনা, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এ গানের চল ছিল।